নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৬৪
©২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পশ্চিমের সাথে মোকাবেলায় ইসলামের অন্তর্গত সংঘাতের অনুধাবন

সায়েমা খাতুন*

কঃ ভূমিকা

এশিয়ার মুসলমান প্রধান ভূখন্ডে কয়েকটি দেশে চলমান ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের সশস্ত্র সংঘাতের উত্তপ্ত বিশ্বে প্রচার মাধ্যমে, বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিকদের দ্বারা[১] মার্কিন তথা পশ্চিমা জগতের সাথে মুসলিম বিশ্বের মোকাবেলার একটি নতুন যুগের আরম্ভের একটা জোর শোরগোল উঠেছে। আমরা দেখেছি, এই সময়ে ইতিহাসের অস্পষ্ট কুয়াশার চাদর থেকে বিশ্ব মঞ্চে ইসলাম ধর্ম ও সমাজ এক রকম নতুনভাবে উদ্বোধন হয়েছে। 'দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা কিংবা অনড় আচার-আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হওয়া জীবন্ত শিলীভূত জীবাশ্ম' থেকে রক্তাক্ত সমরে অবতীর্ণ হয়ে বোরখা-দাঁড়ি-টুপী পরিহিত মহিলা-পুরুষেরা যেন রক্ত-মাংসে জীবন্ত হয়ে কথা বলে উঠেছে। প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান, মিসর, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ায় সুইসাইড স্কোয়াডে মুসলমান যোদ্ধারা যেন মরিয়া প্রমাণ করেছে যে তারা মরে নাই, এবং মারিয়াও; ইতিহাসহীনতা থেকে ইতিহাসের বিন্দুতে এসে ছেদ করেছে খুন করে ও খুন হয়ে। এই খুনোখুনি, আত্মঘাত ও মৃত্যুর মিছিলকে কেবল 'সন্ত্রাস' কিংবা 'জঙ্গীবাদ' নামে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট তো নয়ই, বরং এর অভিপ্রায় রাজনৈতিক। তা পশ্চিমের সাথে পূর্বের বিশেষ সম্পর্কের প্রকাশ। সে সম্পর্ক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে শাসন ও বঞ্চনার সুদীর্ঘ কালের অববমাননাকর সম্পর্ক। সেখান থেকে কেবল "অপর" (other) এর সাথে বিভেদ ও হিংসা জন্মেনি, "আপনার" (self/selves) ভেতরেও বেড়ে উঠেছে বিরোধের বৃক্ষের শেকড়-বাকড়। দীর্ঘস্থায়ী এ সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করতে করতে অন্তর্গত সম্পর্কগুলোর শক্তি ও গুণ নষ্ট হয়েছে, তার অবক্ষয় ঘটেছে। তার জের বয়ে চলছে নিজেদের সমাজের অভ্যন্তরীন সহিংসতার উত্থানে, আত্মঘাত ও অন্তর্ঘাতে- পুরোনো বিরোধের পুনরুজ্জীবনে ও তীব্রতায়।[২] এই পুরোনো বিরোধগুলোকে জানা নিজেকে জানবার অংশ; সে সম্পর্কে বলা নিজেকে পরিবেশনের, আত্ম-নির্মাণ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বের অংশ।

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল:Sayemakhatun@yahoo.com

এই ক্রান্তি পার হবার সময় মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত একজন হবার অর্থও আর এক রকম থাকে না। ধর্মীয় আচার-বিশ্বাসে উদাসীন অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কারো পক্ষেও এর বাইরে থাকা সম্ভব নয়।[৩] জঙ্গী, উগ্রপন্থী, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী,

আলোকিত, যুক্তিশীল, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানমনষ্ক, গোঁড়া, ধর্মোন্মাদ, শান্তিকামী ভাল মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মার্কাগুলোর অর্থ সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে নির্মিত হতে থাকে যার মধ্যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অন্তর্ভূক্ত হতে হয়। 'এই নির্মাণ প্রাচ্যবাদী' - এ পর্যন্ত উন্মোচন করা একটি বড় কাজ হলেও তা নীরবতার বরফ গলানোর প্রথম পর্ব।

সামুয়েল হান্টিংটন সাহেবরাই কেবল পশ্চিমের সঙ্গে ইসলামের বিরোধকে অবিষ্কার করেন, তা-ই নয়- মুসলমান সমাজ ও দেশের তরফ থেকেও রিফ্লেক্সে ঘৃণা- বিদ্বেষ উৎসারিত হতে থাকে। অর্থাৎ, মুসলিম সমাজ থেকেও প্রায় একই বিপরীতমুখী যুক্তিতে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবার কথা ওঠে। পশ্চিমা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহের ওপর অনিয়মিত হামলাগুলোই নয়, মুসলমান দেশগুলোর অভ্যন্তরে এর উদ্দীপ্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এর একদিকে থাকে পশ্চিমীকরনকে প্রতিরোধ করা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা খোঁজার চেষ্টা, তার শেকড়ের অনুসন্ধান করে একটি নির্ভেজাল, অমিশ্রিত বিশুদ্ধ নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্খা, খাঁটিত্বকে পাহারা দেবার দূর্ভাবনা, এক রকমের বুপনিবেশন (decolonization) প্রক্রিয়া; অন্যদিকে সমন্বয়ের (syncretization) কর্মসূচি ও পশ্চিমের উৎকৃষ্টতার সমকক্ষতা লাভের আকাঙ্খা। তবে 'পশ্চিম বনাম ইসলাম' এর ইউনিফর্ম ক্যাটাগরী তৈরি করার পদ্ধতিটা পশ্চিমা; যেখানে পশ্চিমও ইউনিফর্ম, ইসলামও ইউনিফর্ম। অথচ যে বাস্তব জমিনে জহর দরিয়া কহর দরিয়া বয়ে যায়, যেখানে জিন্দেগানির গুজরান, দুনিয়াদারী করে খাওয়া, তার নাম-সাকিন লেখা - তাতে অবিমিশ্রতার অভিজ্ঞতা কোথায়? সেখানে ভেরিয়েবল বহু; অজস্র পারমুটেশন-কম্বিনেশন; সেখানে 'আপন' ও 'পর/অচিন' (self and other) এর সীমান্ত গড়া আর ভেঙ্গে ফেলার অন্তহীন রক্তক্ষয়।

খ. শাসক ও শাসিতের অভিজ্ঞতায় তাফসীরের ভেদ : ঔপনিবেশিত ইসলাম

১.ইসলাম ও পশ্চিমের ভেদ ও অভেদ ঃ ইসলাম ধর্মে একেশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব, প্রেরিত প্রতিনিধি ও অবতীর্ণ আসমানী কিতাব এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের অর্থ কি, কি ধরনের চিন্তা, আচরণ ও ভাবধারা এর প্রকাশ ঘটায় এবং বিভিন্ন জাগতিক

পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করা ইসলামের অন্তর্ভূক্তি বা বহির্ভূক্তি বলে গণ্য তার নির্ভর করে ঈমান, আক্বিদা ও আমল প্রসঙ্গে মূল কিতাবের তাফসীরের ওপর। অর্থাৎ কুরআনের পাঠের ওপর; যেখানে রয়েছে পাঠভেদ। তাফসীর কোন ধারনাজাত আচরণ, আচরণকারী মানুষকে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামিল করে এবং খারিজ করে; সহী-বাতিল-বেদাত, হারাম-হালাল-মাকরূহ নির্দেশ করে। মু'মিন, কাফের, মুরতাদ, বেহেশতী, জাহান্নামী বর্গে বিভক্ত (categorization) করে। ফলে তাফসীরের ক্ষমতা ব্যাপক ও বিস্তৃত। ক্ষমতা ব্যবস্থায় তাফসীরের শক্তি অনেক। মুসলমান জনসাধারণের কাছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মনোভূমি গঠনে তাফসীরের মধ্য দিয়েই ইসলাম প্রতিভাত হয়। তাফসীরের ভেদ বা বহুত্ব এবং নিরন্তর বহুত্বের সম্ভাবনায় ইসলাম ধর্মকে সমাজ বাস্তবতায় ঐতিহাসিকভাবে বহুরূপে দেখা গেছে, যেমনটি ঘটেছে অপর বিশ্ব ধর্মগুলোর ক্ষেত্রেও।[৪] উলেমা বা ইসলামী পন্ডিতগণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাল পর্বে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্রান্তি লগ্নে, শান্তি বা সংঘাতের সময় নির্দেশনা দিতে গিয়ে যুক্তি প্রয়োগ, মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থানগুলো সেই ইতিহাসের সাথে অঙ্গীভূত। এর থেকে সূচিত ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য বিশ্বের মুসলমান জনসাধারণকে বিভিন্ন মযহাব, তরিকত ও ফেরকায় বিভক্ত করেছে। তাদের মধ্যে সমাজ-নমাজের পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এই পার্থক্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বৃহত্তর উম্মাহ বা ঐক্যকে একেবারে মুছে না ফেললেও অন্তর্ঘাতের রক্তাক্ত ইতিহাসও সেই মাটি থেকে বা মন থেকে মুছে যায় নি। একদিকে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা, নবী ও কিতাবের উপর মৌল বিশ্বাসের অভেদ্য ঐক্য ও সার্বজনীনতা যা থেকে উম্মাহর অস্তিত্ব; অন্যদিকে ভাষা, সংস্কৃতি, শ্রেনী ও লিঙ্গীয় মর্যাদা, জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও জাতিগোষ্ঠিগত পরিচয়ের ভেদাভেদ, স্বাতন্ত্র্য, নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযেগিতা অথবা ক্ষমতার লড়াই। 'ক্ষমতার বৈধ অধিকার কার' - 'কি উপায়ে তা সাব্যস্ত হবে এবং সেটা সাব্যস্ত করবার এখতিয়ার কার' - এই তিনটি প্রশ্নে অন্তর্গত সংঘাতের সৃষ্টি। এর ইতিহাস যেমন ধর্মতাত্ত্বিক, তেমনি রাজনৈতিক ও সামরিক- পার্থিব, ইহলৌকিক, জাগতিক, দুনিয়াবী। অতীন্দ্রিয় সত্যের উপলব্ধি ও মেটাফিজিক্সের সাথে এতে রয়েছে প্রত্যক্ষণমূলক সত্যের একটা দিক। সে কারনে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জণ করে সামজিক মানুষ সেই ইতিহাসের সাক্ষীও হতে পারে। এমনকি হতে পারে তার কর্তা, কারক ও ভূক্তভোগী। বিমূর্ততা ও মূতর্তার আন্তঃসঞ্চালণকে মনে রেখেই সেটা তখন প্রত্যক্ষণমূলক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু এবং সতত পরিবর্তনশীল।

অর্থাৎ, ইসলামকে কেবল ধর্মতত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করে, তার তাত্ত্বিক মারপ্যাঁচের মধ্যে তার সামাজিক বিকাশ ও বিভক্তিকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্বাসের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পার্থক্য, মতান্তর, সংঘাত এবং মত থেকে মতে বিশ্বাস

স্থাপনের সংকট, বিশ্বাসের মধ্যকার অন্তর্গত সংগ্রাম একটি আইডিন্টিটি বা পরিচয়ের ভেতরকার ভেদ বা বহুত্ব গঠনের একটি বিরাট দিক থেকে যায়। ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম কেবল একটি ধর্ম বিশ্বাসই নয়, ইসলাম সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও বটে। প্রথম বিষয়ে কাজটি কেবল ধর্মবেত্তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, সেটা তাদেরই এখতিয়ার। দ্বিতীয় কাজটি দায়িত্ব বর্তায় সমাজবিজ্ঞানীদের ঘাড়ে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম কিভাবে এসেছে, সামাজিক অভিজ্ঞতা হিসেবে ইসলাম কিভাবে গঠিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধানের গুরু দায়িত্ব তাদের। ইসলামের ভেতরের ও বাইরের উভয় দিকের দৃষ্টিভঙ্গীগুলোকে সেখানে পর্যালোচনা করা সম্ভব এবং এই বাইরে ও ভেতরের সীমারেখাটা কোথায় কিভাবে কাদের দ্বারা কোন অবস্থায় সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও পরীক্ষা করা। অন্ততঃ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ পাঠে সেই বিবেচনা বাতিল করা অসম্ভব। মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজেও তা প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি মনে করি এবং অবশ্যই আন্তঃর্জাতিক সম্পর্কের অতি জরুরী দিককে তা উন্মোচন করবে।

অন্তর্গত সংঘাতের আলোচনা জরুরী হয়ে পড়ে এমন একটি বিপদগ্রস্থ ও বিভ্রান্তিকর মূহূর্তে যখন ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিকতা ও সভ্যতা আদর্শ ও উৎকৃষ্টতম জীবন-ব্যবস্থা হয়ে উদ্‌যাপিত, যার মর্মে রয়েছে ধর্ম বিশ্বাস ব্যবস্থার, নৈতিকতার, জাগতিক বৈষয়িক আচরনের আমূল সংস্কার। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় ধর্ম বিশ্বাসের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস, ইউরোপে যা ঘটেছে বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আধুনিক পুজিঁবাদী সমাজের আদর্শ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল যে সজ্জার পরিণতিতে আর একটি ধর্মের জন্ম হয়েছিল, যার নাম 'ধর্মনিরপেক্ষতা' যেখানে রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও নাগরিক জীবন থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আইনের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বকে আপাতঃভাবে অপসারণ করা হয় এবং জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাক্ স্বাধীন, মুক্ত নাগরিকের রাষ্ট্রকে আদর্শ ছাঁচ রূপে (ideal type) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইঙ্গ-মার্কিন উপনিবেশের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে এই ছাঁচটির বাজারজাতকরণ ও রপ্তানী থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার একদা উপনিবেশগুলোতে যে ধরনের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে তার 'না ঘরকা না ঘাটকা' চেহারাটা বোঝার জন্য সেখানকার প্রাক-উপনিবেশিক বিশ্বাস ব্যবস্থার পাঠ প্রাসঙ্গিক। উপনিবেশ জগতের বিস্তীর্ন অঞ্চল জুড়ে যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু, অগ্নি ও মূর্তিপুজারী, সর্বপ্রাণবাদী সনাতনী ধর্মগুলো ছিল, তেমনি ছিল ইসলাম। পশ্চিমের সাথে ঔপনিবেশিক অভিঘাত বিভিন্ন অঞ্চলের বহুরকম বিশ্বাসের মানুষের কাছে একভাবে এই পথে আসেনি, তাদের ঔপনিবেশিক রূপান্তর ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন পথে। মুসলিম সমাজগুলোর ক্ষেত্রে সেই বিশেষত্ব ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে, - ইউরোপের জন্য যা অন্ধকার ও বন্ধ্যাত্বের যুগ - মুসলমানদের সম্প্রসারনের সাথে তখনকার পুরোনো লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা; মুসলমানদের স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, সিয়েরা নেভেদা

পর্বতমালার পাদদেশে আন্দালুসিয়া, গ্রানাডার জমকালো নগর ও আল- হামরা প্রাসাদ, আনাতোলিয়া ও বাইজেন্টাইন সংস্কৃতির স্মৃতি (৭১১-১৪৯২ সাল)। এই স্মৃতি নতুন আগ্রাসন উপলক্ষ্যে ,বারংবার বোধন করা হয়েছে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ভাষায়। হাল আমলের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বৈধতা তৈরির সময় নতুন করে উদ্বোধন ও আবাহন করা হয়েছে মধ্যযুগীয় ক্রুসেড ও জিহাদের স্মৃতি। একবিংশে এসে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শের কার্যকরীতা ও ধার কমে আসলে ক্রুসেডার ও জিহাদীদের কবর নতুন করে জিয়ারত করে সাম্পদায়িকতার উদগ্র ঝাঁজে লিখিত হয়েছে নতুন রেসিপি। এই বিপদজনক ব্যঞ্জনকে ভোজসভায় পরিবেশনের সুনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া ছিল।

বিশ্বাসের বিরোধ উপনিবেশনকে সহায়তা করেছে এবং ব্যুপনিবেশনকে করেছে জটিলতর। প্রাচ্যের ধর্মবিশ্বাস ও আসক্তিকেই তার নিকৃষ্টতা ও অবনতির জন্য দাঁড় করাবার সময় অন্তঃবির্ভাজনকে হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছিল এবং এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে কেবল আন্তঃ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই নয় অন্তঃধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও বর্ধিত হয়েছে। সেই বৃদ্ধিতে পাশ্চাত্যের অবদান যথেষ্ট।

এডওয়ার্ড সাঈদ যখন বলেন- 'ইসলাম অনেক', - সেটা কেবল মযহাবের নয়, বিভাজনের (schism) নঞর্থক অর্থেও নয় (সাঈদ:২০০১)। সেটা সমাজের বিষমরূপতা ও বৈচিত্র্যময়তার অর্থে। ইসলাম এর ভাবধারা ও জীবন-ব্যবস্থার (ethos) প্রাচ্যবাদী সাধারনীকরন ও সরলীকরণের বিপরীতে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থাকে তার জটিলমাত্রাকে অনুধাবন করতে গিয়ে সাঈদ তার বহুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। এই বহুত্বের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ তৈরি করাকে আমি একালের[৫] বৌদ্ধিক জগত ও মনীষার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করি, যা ইতোমধ্যেই জ্ঞানজগতের কর্মকারগণ (actors) গ্রহণ করেছেন এবং তার কম্পনও অনুভব করা যাচ্ছে। প্রাচ্যের জন্য তা একদিকে নিজেকে জানবার জন্য প্রাণের গভীর তাড়নাজাত, অন্য দিকে অপরের দ্বারা পরিবেশনের বিচ্যূতি ও গ্লানি থেকে মুক্ত হবার প্রকল্প। অধঃস্তন সত্ত্বার মানসিক ও বৈষয়িক দাসত্ব বন্ধন মোচন। আধুনিককালে এই দাসত্বের নাম ঔপনিবেশিকতা: ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। প্রাক-আধুনিক যুগে ধর্ম ও সংস্কৃতি হিসেবে ইসলামের সম্প্রসারণকালে তার অর্ন্তগত বিরোধ, বিভক্তি ও বিভেদ, যাকে আমি এককথায় বহুত্ব বলতে আগ্রহী এবং পশ্চিমা সভ্যতার সম্প্রসারণকালে (যাকে বলছি আধুনিক কাল) এই বহুত্ব মাত্রাগতভাবে আলাদা। এই মোটাদাগের একটা কালবিভাজন আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনেই আসে। এই প্রসঙ্গেই একই যুক্তি অনুসরনে 'পশ্চিম ও ইসলাম' শিরোনামে আলোচনার ব্যানারে দাঁড়াবার আগেই বলা

প্রয়োজন যে, পশ্চিমও অনেক। শাদা চামড়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রটেস্ট্যান্ট পুরুষই পশ্চিমের একমাত্র প্রতিনিধি নয়; পশ্চিমের সাথে অভেদ নয়।[৬]

এই দ্বি-বিভাজন অক্সিডেন্ট-অরিয়েন্ট (ভৌগলিক নয়, ধারনাগত) বা অন্য যে কোন নামে গ্রহণ করা না করবার সাথে যুক্ত করতে হবে একদিকে ঔপনিবেশিকের শাসন করবার অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে উপনিবেশিতের শাসিত হবার অভিজ্ঞতা। এই দুই অভিজ্ঞতাই আধুনিক কালের সারবত্ত্বা। আধুনিক কালকে তাই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বোঝা যায় দুইভাবে। তবে এই সাদা-কালো বিভাজন করবার সময় ধুসর জগতটাকে মনে রাখলে দেখা যাবে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ মুসলমান ও ইউরোপীয় অধঃস্তন জাতিগোষ্ঠি, শ্রেনী ও লিঙ্গের জনসাধারণ, যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শ্রেনীর সাথে এক কাতারে দাঁড় করানো যায় না। পশ্চিমের অশ্বেতাঙ্গ, অভিবাসী মুসলমাদেরও লুকিয়ে রাখা যাবে না। আর তা হলে ইসলাম কেবল প্রাচ্যও নয়, ইসলাম পশ্চিমও। আর দক্ষিণ,দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতায় ইসলাম আগাগোড়াই পশ্চিম থেকে আগত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের কেবলা পশ্চিমমুখী, আদৌ সেটা মধ্যও নয় প্রাচ্যও নয়, সেটা পশ্চিম এশিয়া। ফলে পৃথিবীর এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেমনভাবে তাকে দেখা যায় তেমনভাবে শাদা চোখে দেখতে পাওয়াই আমাদের শিখে নিতে হবে; পূর্ব-পশ্চিমকে হান্টিংটনদের মত করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয় এখান থেকে। ঈসা-মুসার ধর্মও যেমন প্রাচ্যভূমি থেকেই পশ্চিমে গেছে ইসলামও তাই। কিন্তু নির্দিষ্ট করতে হবে কোন যুগের ইহুদী, ক্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মের কথা বলা হচ্ছে সেখানে: ফেরাউনের যুগের, রোমান না কনস্টান্টিনোপলসের, না কিং রিচার্ড ও সালাহউদ্দীনের যুগের, নাকি জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের যুগের ইসলাম, ক্রীশ্চান ও ইহুদী ধর্ম? এ ছাড়া পশ্চিমের ভেদ বোঝা ভার।

২. উৎপাদন ব্যবস্থানির্দিষ্ট মতাদর্শের বিকাশঃ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সামাজিক মতাদর্শ ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্বাস ব্যবস্থাও অনুরূপভাবে বিকশিত হয়েছে। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় মনোভূমি বা মানসজগত গঠন করেছে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, উৎপাদন ব্যবস্থা মধ্যস্থ উৎপাদনী সম্পর্ককে নির্মাণ ও ও রক্ষণাবেক্ষণে অত্যাবশ্যক মনোজাগতিক ভিত্তি রচনা করেছে; সেখানে ধর্মবিশ্বাস বিরাজ করে একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গরূপে। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিযুক্ত করে তাই কোন বিশ্বাস ব্যবস্থা উপলব্ধি করা যায় না এবং তার রূপান্তর ও বিকাশকেও নয়। এ কারনেই কোন বিশ্বাস ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র কোন ধর্মগ্রন্থ দ্বারা সাধারনীকরণ করা যায় না এবং কোন সার্বজনীন সংঙ্গা দেয়া যায় না। বিশ্বাসকে বুঝতে হয় বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিসরে। অর্থাৎ সেই অঞ্চল ও সময়ের মাত্রার অভ্যন্তরে অথবা পরিপ্রেক্ষিতে। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা স্থান-কাল-পাত্র নির্দিষ্টভাবে বিকশিত হবে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারন করে। তার সঙ্গে বিকশিত

হবে মতাদর্শের দ্বন্দ্বসমূহ এবং বিশ্বাসের বিভাজন। বিশ্বাসের বিভাজন বা বহুত্বের বিকাশও বিশেষ ও নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়। মাঠকর্মভিত্তিক প্রত্যক্ষণমূলক উপাত্ত সংগ্রাহী গবেষনার কারণে নৃবিজ্ঞানে এই ধরনের অনুসন্ধানের সম্ভাবনার দিগন্ত বহু প্রসারিত এবং সে ধরনের দিক নির্দেশনামূলক কিছু গবেষণা ইতোমধ্যে বিদ্যৎসভায় উপস্থিতও রয়েছে।[৭]

তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামের অভ্যন্তরে বিশ্বাসের বিভাজনগুলোকে 'প্রদত্ত', শ্বাশ্বত, বা চিরায়ত আকারে ধরে নিয়ে বর্তমানের যাপিত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে অগ্রসর হলে তা আমাদের একটি সমাধানহীন একটি গোলকধাঁধাঁর ফাঁদে নিক্ষেপ করে; যেখান অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সামনে বা পেছনে কোন গন্তব্যেই যাওয়া যায় না; গেলেও তা হবে আরব্য রজনীর বোতলবন্দী দৈত্যের মত আত্ম-নিয়ন্ত্রণহীন উদ্দেশ্য লক্ষ্যহীনভাবে কেবল গড্ডালিকায় ভেসে যাওয়া।

৩. উপনিবেশিতের ধর্ম, পুনর্জাগরণ ও বিদ্রোহের মনস্কতা ঃ আধুনিক ও প্রাক-আধুনিকের প্রাথমিক কাল বিভাজন এখানে এই কারনেই করা যে, পশ্চিমের সাথে ক্রীশ্চিয়ানিটি বা ক্রীশ্চান ধর্ম এবং প্রাচ্যভূমির সাথে ইসলাম ধর্মের একীভূতকরনের একটা অস্পষ্ট, অনির্ভরযোগ্য ও নিরীক্ষাসাপেক্ষ যোগ রয়েছে। সেটা হল ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের বিকাশ, ভৌগলিক আবিষ্কার, সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার সম্প্রসারন ও আধিপত্য বিস্তারের সাথে যে ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলে দাবী করা হয় তা শাসনকেন্দ্র বা শাসিত রাজ্য উভয়স্থানেই ধর্মকে বাহন করেছিল। একটি বিশেষ ধর্মকে সেই আধিপত্য বিস্তারে হাতিয়ারের ভূমিকায় (instrumental role) রাখা হয়েছিল। ধর্ম তখনকার মতো সেই ধর্মটি ছিল শাসকের ধর্ম: ক্রীশ্চিয়ানিটি। ক্রীশ্চান মিশন, চার্চ, পাদ্রী, যাজকবৃন্দ উপনিবেশিক ব্যবস্থার স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে। সে প্রেক্ষিতে পশ্চিমা সভ্যকরণ প্রকল্প থেকে তাকে আলাদা করা যায় না।

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিম আফ্রিকা, আরব থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বৃহৎ ঔপনিবেশিত অঞ্চল ছিল মুসলিম অধ্যুষিত, সেখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যে মুসলমানদের সংগ্রাম হবে, ইসলামের ভাবধারা থেকে প্রণোদনা তৈরি হবে, তা সহজ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। উপনিবেশে ও উপনিবেশ-উত্তর সমাজে ইসলামী পুনরুজ্জীবনমূলক আন্দোলনের বিভিন্ন তরঙ্গকে মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কার আন্দোলন হিসাবে দেখা গেছে; আবার কিছু ছিল সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। একইভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী অঞ্চলেও পশ্চিমা আধুনিকতার দর্শনের সাথে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের দেওবন্দীয়া

উলেমা ও ইন্দোনেশিয়ায় নাহদাতুল উলেমা গোষ্ঠি মুক্তিসংগ্রামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; ল্যাটিন আমেরিকায় ক্রীশ্চান যাজকেরা এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়া ভূত নৃত্য, আমেরিকান আদিবাসীদের পূর্ব-পুরুষের পুনরুজ্জীবনবাদ, ভারতের মুন্ডাদের উলগুলান, সাঁওতালদের খেরোয়ার-সিধু-কানুর লড়াই, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াই, ফকির-সন্নাসীদের বিদ্রোহ, ওয়াহাবী-ফরায়েজী-খেলাফত আন্দোলন, ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের মত বহু ধর্মীয় বা ধর্মীয় ভাবাপন্ন আন্দোলনের উত্থান ঘটেছে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায়; চরিত্রে তা কখনও প্রতিরোধী, কখনও বশ্য, কখনও সমন্বয়ী, মিশ্র। এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরন রীতির যে পুনর্গঠন করা হয়েছে তা নতুন পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার মনোজাগতিক পন্থা এবং তা মতাদর্শ গঠনের অংশ।

শাসন ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে গিয়ে শাসক যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে এবং যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্টরূপে গড়ে তুলেছে, আর শাসিত তার নিগড় থেকে মুক্তি লাভের জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে যে প্রতি-ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উপলদ্ধি ও গ্রহণ করেছে তার মাপকাঠি পরস্পরের সাথে বিষম-সঙ্গতিপূর্ণ। এই বিষম-সঙ্গতির মধ্যে সেখানকার ধর্মীয় মতানৈক্য ও বিভক্তির সূত্র নিহিত। এই বিভক্তির অর্থ কেবল সেই স্থানের সেই জায়গাতে একটি অর্থ বহন করে, তার ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন সময়ে পরিবাহিত হয়ে গেলে তার পুরোনো অবস্থায় একই বা সমান অর্থ বহন করতে পারে না। ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা তখন নতুন নুতন জীবন্ত মাত্রাগুলো সহকারে সৃষ্টিশীল বৌদ্ধিক জগতের কাছে বিবেচনার দাবী রাখে। ঔপনিবেশিকতার এই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিযুক্তভাবে এর কোন কার্যকরী বিশ্লেষণ চলতে পারে না।

লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ নীতি পুজিঁবাদী রাষ্ট্রনীতির মত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না- বিজয় অভিযানে তার সঙ্গে ছিল পতাকা, বাইবেল ও সাবান। আধুনিকতার প্রকল্প ছড়িয়ে দেবার অঙ্গ রূপে রাষ্ট্রের আগে এবং সাথে এসেছে মিশনারী পাদ্রীরা। আফ্রিকার অনেক সমাজকে[৮] তারা ধর্মহীন ও নৈতিকতা শিক্ষাহীন রূপে চিত্রিত করে ধর্মান্তরনের মিশন গ্রহণ করে যা, সব সময় অপোষে ও অহিংস উপায়ে পরিচালিত হয় নি। ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছিল বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে। ফলে উপনিবেশকারীর যে শুধু নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে তাই নয়, তার ধর্ম উপনিবেশনের বাহনও।

৪. উপনিবেশিকের ধর্ম, পুঁজিবাদী মনষ্কতার ইন্ধন ঃ অন্য দিকে খোদ ইউরোপে পুজিঁবাদ বিকাশে ক্রীশ্চিয়ানিটির প্রধান একটি ধারা মার্টিন লুথার প্রবর্তিত প্রটেস্ট্যান্ট মত পুজিঁবাদের অনুকূল মনোভূমি তৈরিতে কিভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন

করেছিল ১৯০৫ সালে জার্মানীতে সেটা উদ্‌ঘাটন করেন ম্যাক্স ওয়েবার তার "দ্য প্রটেস্ট্যান্ট এথিকস্ এন্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থে (ওয়েবার : ১৯৩০)।[৯] ১৯০৪-৫ এ লিখিত দু'টি প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে লেখা এই গ্রন্থটি ধর্ম ও পুজিঁবাদের সম্পর্ক অনুধাবনে একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে শতবর্ষব্যাপী মর্যাদা লাভ করে এসেছে এবং সমালোচনাও। সামান্য ভিন্ন মতসহ তাকে অনুসরণ করেন ইংরেজ ঐতিহাসিক রিচার্ড এইচ. টনি (টনি:১৯২৬)। একই সাথে তারা দেখান যে পুজিঁবাদী সম্পর্ক সংগঠিত করে সমাজকে বিকাশশীল ও শিল্পোন্নত করে তুলতে ক্রীশ্চিয়ানিটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছিল এবং ইউরোপীয়রা তাকে প্রগতিশীলতার ধর্মে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বৈপ্লবিক উল্লম্ফন সম্ভব হয়েছিল ক্যালভিনিজম ধারা থেকে প্রবর্তিত প্রটেস্ট্যান্ট নৈতিক নীতিমালা ও জীবন-বিধান চর্চার মাধ্যমে। এর বৈশিষ্ট্য হল ঃ যুক্তিশীলতা, কঠোর পরিশ্রম, কৃচ্ছ্রতাসাধন, সময়ানুবর্তিতা ও সময়ের মুল্য, মুনাফা লগ্নি, সম্পদ আহরনের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। এর মর্মমূলে রয়েছে সম্পদ লাভের আকাঙ্খা, ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের ও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টাকে ধর্মীয় মর্যাদায় ও মাহাত্ম্যে ভূষিত করা।[১০] ফলে ধনার্জন বা পুঁজি সঞ্চয়ন প্রায় ধর্মীয় আচারের সমতুল্য নৈতিক মর্যাদা লাভ করে। পুজিঁপতি লক্ষীর বরপুত্র রূপে সমাদৃত হয়। নতুন নৈতিক শিক্ষা, জীবনাচরণ ও মনোভাব সমাজে পুজিঁবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গত করে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে। সোজা কথায়, প্রটেস্ট্যান্ট এথিকসই পুজিঁবাদের মনোভূমি তৈরি করে দেয়। জীবন-বিধানের এই আমূল সংস্কার ছাড়া পুজিঁবাদের বিকাশ বা সমাজ প্রগতি সম্ভব নয়। এভাবে ধর্মীয় সংস্কার উপলক্ষ্যেও যুক্তিবাদীতা ইউরোপীয় সমাজের সহজাত হিসারে পরিবেশিত হল।

ইসলামের মত প্রাচ্যধর্মগুলো এর অন্তর্গত প্রকৃতির কারনেই অসমর্থতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাতে রয়েছে অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতার ঘাটতি। ইসলামী এথিকস্ বা জীবন-বিধান প্রগতিশীল বিকাশের সম্ভাবনাগুলো অবরুদ্ধ করে এবং তা পুজিঁবাদের স্পিরিট বা মর্মচেতনার পরিপন্থী।[১১] আধুনিক পুজিঁবাদী উত্তোরণে প্রগতির অনুসঙ্গী হতে ইসলাম প্রয়োজনীয় প্রণোদনা যোগানে কেবল অপারগই নয় বরং প্রতিবন্ধী। মুসলমানদের পশ্চাদপদতার আসল কারণ হল তাদের ধর্মে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার অভাব - যেখান থেকে বৈষয়িক জগতে উন্নতির আশা করা যায় না। স্বভাবজাত সমস্যার জন্যই বৈষয়িক সৌভাগ্য তাদের হাতে ধরা দেয় না। ওয়েবারের প্রটেস্টান্ট এথিকস্ ও ইসলাম সম্পর্কিত প্রতিপাদ্য পশ্চিমা জ্ঞানজগতে ইসলামের প্রাচ্যবাদী ভিটার এক প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর।

শত বৎসর আগের ইসলামের এই ওয়েবারীয় নির্মাণের মুল ভাবনা আজকের দিনেও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রায় অপরিবর্তিতভাবে টিকে আছে। বিশ্বের মুসলমান

সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের অনুন্নয়নকে যথার্থতা প্রতিপাদনের হাতিয়ার হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক ব্যাপার হল, দু'বছর আগে ১৯০৪ সালে[১২] "এথিকস্" এর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে হার্ভাড, বস্টন, জন হপকিনস্ এর বাঘা বাঘা অধ্যাপক ও পন্ডিতেরা বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি অনুধাবনে ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যেখানে তারা ওয়েবারের যুক্তির কিছু দূর্বলতা সত্ত্বেও একশ বছরের পরবর্তী বিশ্বের অর্থশাস্ত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করেন। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে এতদিন বিবেচনা করা হলেও এই যুগেই আবার ধর্মের প্রসারও ঘটেছে। উদাহরনস্বরূপ: ইভানজেলিক্যাল প্রটেস্টান্টিজম এবং ইসলাম। এই বিষয়ে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিশারদ ও জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিশেল নোভাক ও বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাপক পিটার বার্গার প্রায় অভিন্ন মত পোষণ করেন। ফুকুয়ামা দেখান যে, প্রটেস্টান্টিজমের অনুসারী দেশগুলো ক্যাথলিক বা অর্থডক্স খৃশ্চান অথবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশগুলোর চাইতে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নোভাক চীন ও ভারতের সাম্প্রতিক বিস্ময়কর অগ্রগতির জন্য তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে প্রস্টোন্টিজমের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন, যাকে বার্গার সমর্থন করেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতে বিশ্বাস ব্যবস্থা কিভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা রাখে তার আলোচনাতে বার্গার প্রটেস্টান্ট পেন্টেকোস্টালিজমকে (Protestant Pentecostalism) বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গতিময় ধর্মীয় আন্দোলন বলে বিবেচনা করেন যা হয়ত মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মত অন্যত্রও ভূমিকা রাখতে পারে। ক্যাথলিক অঞ্চলের চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকার প্রটেস্টান্ট পকেটগুলোই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উর্দ্ধগামী সচলতা দেখাচ্ছে বলে তার ধারনা এবং জাপানের সামুরাই জীবন-ধারায় কনফুসীয় ধর্মের বি-সামরিকীকরণ এশীয় হয়েও জাপানের অভাবনীয় উন্নতির কারন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নতির দাওয়াই হল প্রটেস্টান্ট নৈতিকতা বা তার অনুরূপ নৈতিকতা গঠন করা বা রুঢ়ভাবে বললে প্রটেস্টান্টিজমই প্রগতি ও উন্নতির পথ। অর্থাৎ প্রাচ্যের ধর্মগুলোর সংস্কার সাধনের দিকে ইঙ্গিত আসে।[১৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ওয়েবারের প্রাচ্যবাদী ব্যাখ্যার শক্তি আজও সমান বা নতুন প্রেক্ষাপটে পুনরুজ্জীবিত যেখানে ইসলামের অগ্রগতির সম্ভাবনা অন্য যে কোন বিশ্বাসের তুলনায় সবচাইতে দূর্বল। ইহুদী ধর্মের চেয়ে নবীন ও ইসলামের চেয়ে প্রাচীন হয়েও ক্রীশ্চান ধর্ম প্রগতি ও অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সেটা হয়েছে তার সেক্ট/মযহাব/মার্গ/ফেরকার বিভাজনের মধ্য দিয়ে। অর্থডক্স ও ক্যাথলিক রক্ষণশীল মার্গের থেকে বেরিয়ে এসে সুসংস্কৃত প্রটেস্ট্যান্ট মার্গের পত্তন ক্রীশ্চিয়ানিটিকে প্রগতির দুরন্ত ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছে। এই সংস্কার ও সেক্ট

বিভাজন শাসকের অন্তর্গত বিভক্তি ও বিরোধকে তীব্র করে তুলেছিল কিনা, শ্রেনী সংগ্রামে কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে, তা আমরা খুব কমই জানতে পারি। বরং ইউরোপের মতাদর্শিক শক্তির উৎস ও নৈতিক প্রেরণা হিসেবে বিভাজন ও নতুন মযহাব সৃষ্টিকে দেখা গেছে। নতুন ধর্মমত তার গতির প্রতি নৈতিক ও আবেগীয় শক্তি ও সমর্থন দান করেছে। ফলে ধর্ম এবং তার প্রগতিশীল সংস্কার, নৈতিকতার পুর্নগঠন ইউরোপে ইতিবাচক অর্থ তৈরি করেছে।

অন্যদিকে পশ্চাদপদতম প্রগতিবিরোধী নঞর্থক ধর্ম ছাড়া ইসলামকে আর কোন ভাবে দেখা যায়নি। মুসলমানদের যে পশ্চিমা প্রগতির বিরোধীতা করতে দেখা যাবে তার ব্যাখ্যার জন্য তার বিশ্বাস ব্যাবস্থাই যথেষ্ট। তারা ব্যত্যয়হীনভাবে প্রগতি বিরোধী, ধর্ম বিশ্বাস যার ভিত্তি। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল আন্দোলনে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ তাদের স্বভাবজাত ক্রোধ-ক্ষোভ-প্রতিশোধস্পৃহা-জিঘাংসার প্রকাশ, কালচারাল স্কিজোফ্রেনিয়া বা সাংস্কৃতিক মনোবিকার মাত্র, সেখান থেকেই প্লেন হাইজ্যাক, বোমা হামলা, আত্মঘাতী হামলা - সবকিছুর খুব সরল সমীকরণ করা যায়। তার সেক্ট/ মার্গ/মযহাব/ফেরকা বিভাজন হানাহানি ও রক্তপাতের উৎস। সেই হানাহানিতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভদ্রলোক পশ্চিম জড়িত হয়ে পড়ে দূর্গতকে উদ্ধারের তার নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে।

এদিকে পশ্চিমের অভিযোগের মোকাবেলায় ইসলামের ওয়াকালিয়াত করেছেন আধুনিক ও প্রগতিশীলতা সম্পন্ন মুসলমান লেখকবৃন্দ। তাদের মধ্যে ইসলামকে যুক্তিশীল প্রগতির ধর্ম রূপে পুরাবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রকাশিত সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত সুবিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য স্পিরিট অব ইসলাম" (আলীঃ ১৯২২) এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে।[১৪] শরীয়তের গোঁড়া আচার-আচরণের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখার বাইরে ইসলামের মর্মচেতনাকে তিনি রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুক্তিশীলতা ও দর্শনের মধ্যে আবিষ্কার করে আধুনিক মুসলমানদের উদারনৈতিক চিন্তাবিদ বলে পরিগণিত হন। ইসলামের স্পিরিট আবিষ্কার করবার পেছনে তাঁর সমকালীন সমাজ বিজ্ঞানী ওয়েবারের "প্রটেস্ট্যান্ট স্পিরিট' এর কোন প্রেরণা বা প্রভাব আছে কিনা জানা কঠিন; তবে গ্রন্থের নামকরণের সাদৃশ্য আমাদের চমকিত করে।[১৫]

হাল আমল পর্যন্তও ওয়েবারের প্রটেস্ট্যান্ট পক্ষপাতের পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে, এর বিপরীতে ইসলামকেও প্রগতির সম্ভাবনাময় ধর্ম হিসেবে দেখে; যেখানে ইসলামও ব্যক্তিমালিকানা ও পুঁজি বিকাশে, শিল্পভিত্তিক নাগরিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনুকূল মনোভাব গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন। আয়-উন্নতি, রোজগারে বরকত লাভ , ধনসঞ্চয়নে ইসলামী ভাবধারা নিরুৎসাহিত করে না বরং অনুকূল মনোভাব পোষণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামে নবীর বৃত্তি

বলে মর্যাদাপূর্ণ এবং সঙ্গত মুনাফা অর্জনও প্রশংসিত। প্রটেস্টান্ট এথিকস এর সদৃশভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ইসলামিক এথিকস্ এর উপযোগিতা উপস্থাপন করেন (হোসেন :২০০৪), যদিও ক্যালভিনিজম প্রভবিত মার্টিন লুথারের 'ওয়ার্ক এথিকস্' ভিত্তিক অনুরূপ কোন ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ইসলামের ক্ষেত্রে ঘটেছিল কিনা বলা মুশকিল এবং এর সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যক্ষণমূলক উপাত্ত এখন পর্যন্ত দূর্লভ। সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু যাদের হাতে পুজিঁবাদের প্রথম বিকাশ এবং চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ ঘটেছিল তার নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা ছিল না, তখন থাকলে কি হতে পারতো তার আলোচনা নিরর্থক। ঔপনিবেশিত বা শাসিতের অভিজ্ঞতাই আধুনিক কালের ইসলাম ধর্মালম্বীদের প্রধান অভিজ্ঞতা।[১৬] এবং ঔপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে মুসলমান সমাজ ও উপনিবেশ-উত্তর আধুনিক রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের প্রকৃতির ধ্রুপদী নয়, তা বৈশ্বিক পুজিঁবাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্য বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক বা নির্ভরশীল পুজিঁবাদ। এই বৈশ্বিক ব্যবস্থাই সমকালীন বাস্তবতা গঠন করেছে। তারই পরিসরে আমরা বাস করি ও কথা বলি।

গ্যয়টে ইন্সটিটিউট ও GTZ (German Agency for Technical Co-operation) আয়োজিত The Understanding of Progress in Different Cultures" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন,' ০৪ এ আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ আবু জেঈদ ('মধ্যপ্রাচ্য'এর এই একমাত্র নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা) ও অন্যান্য পন্ডিতবর্গ[১৭] খোদ 'প্রগতি'র ধারনাটিকেই সংশোধন করে নেন পশ্চিমা পক্ষপাতিত্ব থেকে এবং এর সংস্কৃতিগত বিশিষ্টতার ওপর জোর দেন (জেঈদ:২০০৪)। জেঈদ জার্মান পন্ডিত ওয়েবার এর প্রতিপাদ্যটিকে নাকচ করে দেন যে, প্রটেস্ট্যান্টবাদ ও পুজিঁবাদের সাথে আধুনিক অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা থাকলেও তা কোনভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ মনোভঙ্গী গড়ে তুলবার সাথে আবশ্যিকভাবে বিশেষ কোন একটি নিয়ামক , একটি ধর্মমতকে (এই ক্ষেত্রে প্রটেস্ট্যান্টবাদ) নির্দেশ করতে পারে না। তা হলে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মতধারাবলম্বী জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীনের কিংবা মুসলিম প্রধান মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অথনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতিকে কিভাবে বোঝা যাবে। ইসলামকে 'মরুভূমিতে জন্মানো যোদ্ধার ধর্ম' হিসেবে দেখবার সময় ওয়েবার যে সত্যকে বিস্মৃত হয়েছেন তা হল, ইসলামের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র মক্কা নগরীতে এবং বেড়ে উঠেছিল আল-মদিনাতে যার শাব্দিক অর্থ 'নগর' অর্থাৎ নগর সম্প্রদায়।

৫. অজ্ঞানতার গভীরেঃ ভৌগলিক ও মতাদর্শিক প্রাচ্যে দাঁড়িয়ে আমরা একভাবে দেখতে পাই, কিভাবে ইসলামের ভেতর অন্তর্গত সংঘাতগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং সেই সংঘাতগুলো ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়েছে। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে যারা দ্রুত ও সরাসরি শ্রেনী সংগ্রাম বলতে চাইবেন, অন্তর্গত সংঘাত নিয়ে তাদের ভিন্নমত হবার অবকাশ থাকে না।[১৮] সে রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যথেষ্ট মাল-মশলা এখন আমাদের হাতে নেই। আমাদের হাতে যেটুকু সুলভ, সেটুকু থেকে আমরা বুঝতে পারি এবং এইটুকু বলতে পারি যে, ইসলামের মধ্যে গড়ে ওঠা অন্তর্গত সংঘাত ও বিরোধের বিকাশ ঘটেছে জটিল ঔপনিবেশিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এর সরলীকরণের কোন সুযোগ নেই। বস্তুগত বাস্তবতার অন্তঃপ্রবিষ্ট উপাদানগুলোর উপস্থিতি কিভাবে তার সাথে সম্পৃক্ত তার দুরূহ ব্যাখ্যায় হাত দিতে হবে। ব্যপনিবেশনের সংগ্রামের প্রতিমূহুর্তে এই সংঘাতগুলো ও তাদের নব নব রূপান্তরের যথার্থ তাৎপর্য ও বহুমাত্রিকতার গুরুত্বের অনুধাবন জরুরী; সেটা বৃটিশ ভারতের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা থেকে শুরু করে, ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন পরবর্তী ইরান-ইরাক-পাকিস্তানের কুর্দি-শিয়া-সুন্নী উত্তেজনা,বাংলাদেশের কাদিয়ানী ও আহমেদিয়াদের ওপর পুনঃপুন হামলা কিংবা ভিন্ন মতপন্থার মুসলমানদের কাফের-মুরতাদ ঘোষনা করবার, নির্মূল করবার উন্মাদনা থেকে বহু মত-পথের স্থানিক ও বৈশ্বিক সংঘর্ষ এবং জাতীয় রাষ্ট্রে সেক্টভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠা[১৯], তাদের কর্মসূচি, আন্তঃসংর্ঘষ, জাতীয় নির্বাচন ও ভোটের রাজনীতিকে অন্তর্ভূক্ত করে। এই হল আমার প্রথম প্রস্তাবনা।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হল ঃ অন্তর্গত সংঘাতের ইতিহাস পশ্চিমের সম্প্রসারনের কালে জন্ম নেয়নি,(বিশেষ রকমভাবে বেড়ে উঠেছে মাত্র) ইসলামের সম্প্রসারণকালেই তার জন্ম ; এবং এটা কোন নতুন কথাও নয়, কেবল নতুন করে বলা। তাই পশ্চিমা উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী. আগ্রাসন নামক ভারী ভারী ও ক্লিশে অথচ প্রাসঙ্গিক শব্দবন্ধগুলোর কাছেই সব প্রশ্নের জবাব থাকবে, এমন নয়। পশ্চিমে সবকিছুর শুরু হয় নি এবং সেখানেই সবকিছুর শেষ নয়। ঐতিহাসিকতার গভীরে পৌঁছানোর প্রসঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আজ অব্দি এই পাঁচশত বছরই যথেষ্ট নয়। নৃবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তাগণ সে রকম অনুসন্ধিৎসার পথে যথেষ্টভাবে না হলেও এগিয়েছেন। মার্গীয় বা মযহাবীয় পার্থক্যগুলো একটি প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিরাজ করে এবং তার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসও রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য বলতে যদি কেবল স্কিজম (schism) বা ধর্মবিচ্ছেদী বিভেদমূলক বিরোধী দল গঠনকে না বুঝি তাহলে বৈচিত্র্যও এর অন্তর্ভূক্ত হবে যা কেবলমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক নয় - যার কথা এখানে বার বার বলা হয়েছে। এই মযহাবগুলোর বিকাশ ও ভৌগলিক বিস্তারও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং সমাজের অপরাপর উপাদানগুলোর সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ইতিহাসে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে 'এর যোগকে

কিভাবে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে আরবী, ফার্সী, তুর্কি প্রভৃতি প্রাচ্যের ভাষাজ্ঞানের অভাবে প্রত্যয় করে বলা কঠিন। যেভাবেই হোক মূলধারায় তা পৌঁছে নি; বাংলা ভাষাতেও তার হদিস মেলে না। প্রচলিত বয়ানটিও আমাদের ভাল করে জানা নেই, বিশেষ বয়ানসমূহের কথা বলাই বাহুল্য।

এই দুই মাত্রাকে খতিয়ে পাঠ শুরু করার প্রয়োজন।

গ. ইসলামের ভেতরে : মযহাব, তুরিকত, ফেরকা এবং মৌল ও যৌগ ইসলামের অনুধাবন[২০]

And hold fast, All together, by the rope which God (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude God's favour on you; For ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His grace, Ye became brethren; And ye were on the brink of the pit of fire, and He saved you from it. Thus doth God make His signs clear to you: that ye may be guided.
Qur'an 3:103

বিভিন্ন সূত্র পাওয়া তথ্য গ্রন্থিত করে মযহাব,তুরিকত ও ফেরকার উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কে একটি সংক্ষেপিত চিত্র দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হল।[২১]
হজরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায়ই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত বিরোধীদের অস্তিত্ব দেখা যায়, যারা অনেক ক্ষেত্রে ছিল অনারব বা পূর্ব আরবের প্রাধান্যশীল গোত্র যারা পশ্চিম আরবের কুরাইশ বংশের অভিজাত্য ও নেতৃত্বের প্রতি নাখোশ ভিন্ন মরু গোত্রের বেদুঈন। প্রথম শতাব্দীর অভিজ্ঞতার মধ্যেই ইসলামের মূলধারার বিশ্বাস ও নেতৃত্বের সাথে সংঘাতের দ্বারা একটি দল বেরিয়ে পড়ে। এই বিরোধের সূত্রপাত নবীর খিলাফত তথা রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও কর্তৃত্বের দাবীকে কেন্দ্র করে। খোলাফায়ে রাশেদীন এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রহঃ), তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রহঃ) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রহঃ) রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে আততায়ীদের দ্বারা শাহাদাত বরন করেন। এই সংঘাত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে মুহম্মদের (সাঃ) মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দাবীর পন্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মুসলিমদের প্রথম গৃহযুদ্ধের (৬৫৬ সালে ওসমান-ইবনে আফানের হত্যা এবং ৬৬১ সালে আলী ইবনে আবু তালিবের হত্যার মধ্যবর্তী সময়ে) মধ্যে। ইসলামে ইতিহাসে এটি প্রথম ফিৎনা এবং ইসলামী উম্মাহর প্রথম ফাটল হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

শেষ খলিফা হযরত মুহম্মদের (সাঃ) চাচাতো ভাই ও জামাতা আলীর খিলাফতের দাবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক বিতর্ক। যে বিতর্ক নিষ্পত্তি হবার জন্য একাধিক যুদ্ধের অবতারনা ঘটে। খিলাফতের অন্যতম দাবীদার আলী

যখন ওসমানের মৃত্যু পরবর্তী নৈরাজ্যমূলক অবস্থায় চতুর্থ খলিফা রূপে বায়েত গ্রহণ করেন, তাকে বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধটি ছিল জঙ্গে জামাল যেখানে তিনি প্রথম খলিফা আবু বকরের কন্যা ও মুহম্মদের (সাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয়টি ছিল ওসমানের আত্মীয় ও সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার সাথে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ। ওসমানের মৃত্যুর দায় আলীর ওপর রয়েছে বলে এরা মনে করেছেন। মুয়াবিয়ার সৈন্যরা বর্শার অগ্রভাগে কুরআন বেঁধে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে খিলাফতের দাবী নিস্পত্তির জন্য সালিশীর প্রস্তাব আনে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে ইতিহাসের কয়েকটি মোড় পরিবর্তন ঘটে। আলীর বেশির ভাগ সৈনিক তার পক্ষে থাকলেও একটা অংশ, উল্লেখ রয়েছে ১২,০০০ এর একটি দল, আলীর পক্ষে এই সালিশীর প্রস্তাব গ্রহণকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আল্লাহই একমাত্র খিলাফতের মীমাংসা দানের অধিকারী, মীমাংসার অধিকার মানুষের নেই। তারা আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ের বিরোধীতা করে ও পক্ষ ত্যাগ করে ভিন্ন শিবিরে চলে যায়। এরা ছিল প্রধানতঃ পূর্ব আরবের বনি হানিফাহ ও বনি তামিম গোত্রের লোক। বনি হানিফাদের কাছে কুরাইশ গোত্রের সন্তান মুহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সমগ্র আরব ভূ-খন্ডের ওপর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি পরবর্তীতে এদের মধ্য থেকে আর মুসাইলেমাহ নামে একজন নবুয়তের দাবীদারেরও আগমন ঘটেছিল। মুহম্মদের (সাঃ) নবীত্বের অলৌকিকতাকে (sacredness) অস্বীকার করে তারা আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতই তার পার্থিবতার (profaneness) ওপর জোর দেয়। এরাই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম উৎপথগামী, যারা রাফেজী বা খারেজী নামে পরিচিত হয়েছে। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলী খারেজীদের পরাজিত করলেও তিনি এই দ্বন্দ্বের পরিনতিতেই নিহত হন। মুয়াবিয়া আমীরুল মুমেনিন উপাধি গ্রহণ করে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, যা ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

উমাইয়াদের রাজত্বকালেও এই সংঘাত প্রশমিত না হয়ে বরং আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। বনি উমাইয়াদের সঙ্গেও খারেজীরা বিরোধে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক মতানৈক্যর ফলে ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে, যতদূর জানা যায় এ পর্যন্ত খারেজীদের পনেরটি শাখার অস্তিত্ব দেখা গেছে। ইরাকের কুফা নগরীর অদূরে কারবালায় মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে আলীর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেন এর শাহাদাতের পর মূলধারার মুসলিম জগত স্পষ্টভাবে শিয়া ও সুন্নী - দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোথাও উল্লেখ দেখা যায় যে, এজিদের সেনাবাহিনীতে খারেজীরা ছিল আবার এদের একাংশ তাক্‌ইয়াহর নীতিতে শিয়াদের মধ্যে আত্মগোপন করে। আহলে বায়েত তথা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের প্রতিপত্তির প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে তারা খিলাফতের ক্ষেত্রে যে কোন বংশ,

গোত্র বা সম্প্রদায়ের সমান দাবীর বিবেচনা তোলে;যেখানে উক্ত ব্যক্তির ধার্মিকতাই সর্বোচ্চ গুণ বলে বিবেচ্য, সে এমনকি আবিসিনীয় দাস হলেও। এক অর্থে তা কর্তৃত্বকেন্দ্রীকতার বিরোধী ও জনগণতান্ত্রিক প্রকৃতির হলেও অপর মুসলমানদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু ; তারা নিজেদের ছাড়া যাবতীয় মুসলমানদের কাফের ও মোশরেক অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলে থাকে ও তাদের আবাসভূমিকে দারুল কুফর অভিধা দেয়। এমনকি এই ভূ-খন্ড আক্রমণ করা ও মুশরিকদের হত্যা করা জায়েজ বলে ফতোয়া দেয়। অপর মুসলিমদের প্রতি এই চরম অসহিষ্ণুতা ও তীব্র বিদ্বেষের কারনে এরা চরমপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে পরিচিত হয়।

মুসলিম সালতানাৎ বা সাম্রাজ্য ছিল মূলতঃ সুন্নীদের অধিকারে। সুন্নী খিলাফতের প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে ৬৯০-৭৬০ সাল পর্যন্ত খারেজী মতাদর্শের বেশ প্রভাব ছিল; এরা দক্ষিণ ইরাকের বসরা নগরের মত সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিক কেন্দ্রেই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে এবং এখনও রয়েছে বলে মনে করা হয়। তারা মিশর ও মাঘরেবে (পশ্চিম আফ্রিকা) ছড়িয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রবিরোধীতাকারী শক্তির সপক্ষে এবং স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের কালে মাঘরেবের বারবারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আরব পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করে স্থানীয় সম্পদায়গত শাসন পদ্ধতির সাথে বিশিষ্ট ধরনের একাধিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে। এদের একটা অংশ ওমানে বসতি স্থাপন করে (৬৮৬ সালে) এবং আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, জাঞ্জিবারেও কিছু সংখ্যায় রয়েছে।

এরা একদিকে উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের বংশগত অধিকারের পরিবর্তে মুমিনদের পুরো সম্প্রদায় দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ওপর জোর দিয়েছে, অন্যদিকে আইনী ফয়সালার ক্ষেত্রে কেবল কুরআনের মূল ভাষ্যকেই একমাত্র গ্রাহ্য বলে থাকে- "একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন"। এর যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ও তাদের বৈধতার বিরোধীতা করে। নবী, আছহাব,আহলে বায়েতগনের মাজার জেয়ারত করা নিষিদ্ধ করে এবং সে সব ভেঙে ফেলে। সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রেরিত পুরুষের সম্পর্কের ব্যাখার ভিন্নতা এবং তার থেকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্তৃত্বের বৈধতা ও সীমা নির্ধারণই এই বিরোধের কেন্দ্র। রেসালত বা খোদার প্রতিনিধিত্বের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব মর্যাদা, রসুলের মানবত্ব ও ঐশ্বরকিতা নিয়ে এই বিতর্কের আবর্তন। ফলে ধর্মাচারের অঙ্গ হিসেবে রওজা জেয়ারত, দরুদ পাঠ, মৌলুদ শরীফ, ঈদ- এ-মিলাদুন্নবী পালনের বিরোধী। ইসলাম ধর্মের প্রথম ও মৌল বিশ্বাস কলেমা শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ থেকেই বিশ্বাসের বিভাজন ঘটেছে; যেখানে ঈমানের অংশ কেবল তৌহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসই নয়, 'এরফানে মোহাম্মদী' ও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দুই অংশ থেকে উদ্ভুত হয় দুই প্রকারের জ্ঞান: মারফতে এলাহি ও মারফতে মোহাম্মদী। শিরক বা স্রষ্টার সমকক্ষতার ব্যাখায় নবী ও আহলে

বায়েত ও আধাত্মিক ব্যক্তিদের প্রতি আনুগত্য ও আচরণ নিয়ে সুন্নাত জামাত বা সুন্নীদের সাথে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ-সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কলেমার দ্বিতীয় অংশের সংস্কার করাও হয়েছিল[২২] এবং সুন্নীদের দ্বারা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। এই দিক থেকে সংস্কার মূলের প্রতি ফিরে যাওয়ায় নয়, বরং মূলকেই সংস্কার করা হয়েছিল।

আবার এই সময়ের মধ্যেই ইসলামী সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্ববর্তী বিশ্বাসসমূহের ওপর এই বিস্তার যেমন ছিল রাজনৈতিক,সামরিক ও ঐহিক - তেমনি নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক। এই সময়েই বিশেষভাবে রোমের ধর্মগুরুর নেতৃত্বে পশ্চিমা ক্রীশ্চানরা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে ধর্মীয়-সামরিক মোকাবেলা করেছিল জেরুজালেমের ওপর দখল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। তবে মুসলমানদের মত পূর্বাঞ্চলের অর্থডক্স ক্রীশ্চানের কাছেও তা পশ্চিমের হামলা বলে গণ্য হয়েছে।[২৩] উমাইয়াদের পর আব্বাসীয়রা ১২৫৮ সাল পর্যন্ত পাঁচশত বছর ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি থাকে এবং এ সময়েই ইসলামে অনারব সংস্কৃতির প্রাধান্য তৈরি হয়। ক্রুসেডারদের পরাজিত করে ক্ষমা করে দেবার জন্য দ্বাদশ শতাব্দীর যে মুসলিম রাজা 'মহান সালাউদ্দিন' নামে খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি ছিলেন মেসোপটেমিয়ার কুর্দি জাতির মানুষ। স্পেন ও বাগদাদ দুটি প্রধান শাসন কেন্দ্র এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র রূপে উত্থিত হলে তাতে অনারব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিশ্বখ্যাত মদিনাত-আস- সালাম বা বাগদাদকে কেন্দ্র করে ফার্সী সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের শেকড় প্রোথিত হয়ে একটি বিশিষ্ট মর্যাদাকর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে প্রবেশের সময় আদি আরব চরিত্র থেকে ইসলাম তার ফার্সী চেহারায় উত্তর ভারতে স্থাপিত হয়েছিল।

আলীর খিলাফতের সমর্থকদের দলটি শি–আত আলী (শিয়া) বা আলীর দল নামে পরিচিত হয় যার কেন্দ্র পার্শিয়া বা আজকের ইরান (যদিও সেখানে তাদের জন্ম নয়) যেখানে নিকটবর্তী অঞ্চল যেমন মেসোপটেমিয়া বা ইরাকের মানুষও যোগ দেয়। মনে করা হয় যে, মোটমুটি ১৪ শতাংশ মুসলমান শিয়া মতাবলম্বী যারা উমাইয়াদের খিলাফতকে অবৈধ বিবেচনা করে এবং একই সঙ্গে আবার মসজিদে নামাজের সময় প্রকাশ্যে আবু বকর, ওমর ও ওসমানকে ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাতও করে। শিয়া মতালম্বীরা ইমামকে নবীর প্রতিনিধি মনে করে যে কেবল ধর্মীয় প্রার্থনায়ই নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ নন। যেহেতু ইসলামের প্রকৃত ইমামদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে খিলাফত বিচ্যুত ও বিনষ্ট হয়েছে, মেসিয়াহর মত ইমাম মেহদীর আবির্ভূত হয়ে খিলাফতকে পুনুরদ্ধার করবেন বলে তারা বিশ্বাস করে। শিয়ারা সম্পূর্নভাবে কোরানকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং নবীর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রেওয়াজকে প্রত্যাখান

করে যা সম্ভবত প্রাচীন পার্শীয় বংশীয় উত্তরাধিকারের প্রতি আনুগত্যের প্রতিফলন। আব্বাসীয়দের খিলাফত অর্জনে সাহায্য করবার আগ পর্যন্ত উমাইয়ারা শিয়াদের বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ইমামের প্রতি আনুগত্য বিদ্যমান খিলাফতের প্রতি অস্বীকৃতি শিয়াদের প্রতি তৎকালীন মুসলিম শাসকদের ক্রোধ সৃষ্টি করে এবং তারাও মতভেদের মধ্য দিয়ে আবারও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খিলাফত আরব, পার্শীয় হয়ে তুর্কীদের হাতে চলে যায়। ১৯২৪ সালে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন এবং সুন্নী খিলাফতের অবসান ঘটে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে ধর্ম অপসারিত হয়। এরপর মুসলমান-প্রধান দেশে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ নির্ভর আধুনিক ধাঁচের রাষ্ট্র পৃথক পৃথকভাবে গঠিত হতে দেখা যায় যা পূর্ববর্তী খিলাফত সাম্রাজ্য থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। বর্তমানকালে নিখিল বিশ্ব ইসলামী উম্মাহভিত্তিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে উঠলেও এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে মযহাবের বিভাজন ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন উলেমার পথ অনুসরণ করে। ইমাম হানাফী, ইমাম শাফি, ইমাম মালিকি ও ইমাম হাম্বলির তাফসীর ও ফিকাহ অনুসারে আইনী ব্যাখ্যার তারতম্যের ওপর হানাফি, শাফি, মালিকি ও হাম্বলি মযহাবের সূত্রপাত হয় এবং এই মযহাবসমূহ পরস্পরের কাছে সহী বলে অনুমোদিত। শিয়া মতাবলম্বী আইনী ব্যাখ্যার প্রধান ধারা হল জাফরী। মযহাবের বিভাজনকে অস্বীকার করে একদল মুসলমান নিজেদের আহলে হাদীস বা লা-মযহাবী বলেন। এই মযহাবের বিকাশ ও আঞ্চলিক বিস্তারে রয়েছে নির্দিষ্ট সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সিলসিলা বা পরম্পরা।

পুরাতন খারেজিদের থেকেই সালাফী বা ওয়াহাবী বা লা-মাযহাবী মতের জন্ম, যারা একইভাবে একমাত্র নিজেদের সঠিক ইসলামের বাহক মনে করে সকল ধারাকে বাতিল মনে করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করে। সালাফিরা সুন্নীদেরই মধ্যকার একধরনের সংস্কার আন্দোলনের অংশ; বিশ্বাসের আনুগত্য মযহাব বিভাজনের পূর্ববর্তী আদি ইসলামের প্রতি। সালাফ হল পূর্বসূরী; আল-সালাফ আল-সলিহ (righteous predecessors) বা সাহাবা, তাবেঈন, তাবা-তাবেঈন - এই তিন প্রজন্মের (pious generations) আদি মুসলমানদের জীবন আচরণই শুদ্ধ ও আদর্শ এবং সেটাই তারা ফিরিয়ে আনতে চায়। আদি ও অকৃত্রিম ইসলামের মধ্যে পরবর্তীকালের সংযোজনগুলোর অনুপ্রবেশ ও মিশ্রন তাকে উৎকৃষ্টত্ব থেকে বিচ্যুত করেছে। মূলধারার ধর্মতত্ত্ব বা কালাম প্লাতো ও আরিস্ততলের গ্রীক দর্শন থেকে প্রবেশ করেছে যাকে শোধন করে বিশুদ্ধতা পুররুদ্ধার করতে হবে। এই আদিতে ফিরে যাবার

দর্শন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ফিরে ফিরে এসেছে, বিশেষভাবে 'বহিস্থ' কর্তৃত্বকে নাকচ করতে।

খারেজিদের প্রধান আধুনিক শাখা ওয়াহাবী যার প্রবর্তক আরবের নজ্দ প্রদেশ নিবাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী (১৭০৩-৯২ সাল) এবং তার পুত্র মোহাম্মদ নজদী; তুরস্কের মোহাদ্দেস এবনে তায়ামিয়ার (১২৬৩-১৩২৮ সাল) অনুসারী। মোঙ্গল আক্রমনের সময় এর পরিবার সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানেই বসতি স্থাপন করে। নজ্দ প্রদেশের ছোট্ট শহর ইউইয়ান থেকে ওয়াহাব তার মত প্রচার শুরু করেন। দ্বাদশ হিজরীতে আরবের নজ্দ প্রদেশ তুরস্কের সুলতানাতের অধীনে ছিল[২৪], খলিফার দুর্বলতার সুযোগে ওয়াহাব তার পুত্র মোহাম্মদ ও অনুসারীদের নিয়ে জুম্মাতে সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম জগতকে শেরক ও কুফরী থেকে উদ্ধার করবার জন্য জেহাদের ঘোষনা দেন এবং 'আমিরুল মোমেনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। এবং মযহবের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'কেতাবোত তাওহীদ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন[২৫], যা ওয়াহাবী মতাবম্বীদের অনুসরনীয়। আব্দুল ওয়াহাব ঘোষনা করেন যে, তার অনুসরণকারী ব্যতীত সকল মুসলমান কাফের ও মোশরেক এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে জেহাদ বলে অভিহিত করেন। কেতাবোত তাওহীদের পর মুসলমানদের জন্য অন্য কোন হাদীসের তাফসির অথবা হাদীস গ্রন্থের ফেকাহ্ কেতাবের প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করা হল না এবং ধর্মীয় গ্রন্থগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেবার আদেশ জারী করা হল। তখন অসংখ্য হেজবুল বাহার, দালায়েলুল খায়রাত ও আন্যান্য অজিফার কেতাবগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। তার পুত্র সোলায়মান এবনে আব্দুল ওয়াহাব পৈতৃক মযহাবের ঘোর বিরোধী হয়ে পড়েন। মোহাদ্দেস ও মুফতী হজরত শেখুল ইসলাম ছাইয়েদ আহম্মদ এবনে জাইনী দোহলান 'আদ্দোররোস্ সুন্নিয়া' নামক গ্রন্থে লেখেন যে, ১২২১ হিজরী থেকে সিরিয়া, মিশর ও অন্যান্য দেশের সুন্নী মুসলমানগণের জন্য হজ্জ করা নিষিদ্ধ করা হয়।

বনু খালিদ এর আল আহসা ও কোয়াতিফের দলপতি সুলায়মানইবনে মুহাম্মদ আল হামিদি ওয়াহাবের মত খন্ডন করেন। হানাফী মযহাবের অনুসরনীয় কেতাব 'রাদ্দোল মোহতার' অনুসারে ১২৩৩ হিজরীতে তুরস্কের খলিফা সুলতান মাহমুদ খান গাজীর নির্দেশে গাজী ইব্রাহীম পাশা ওয়াহাবী সেনাপতি সৌদকে পরাজিত করে ওয়াহাবীদের কর্তৃত্ব খর্ব করেন। বিতর্কিত গ্রন্থ প্রচারের দায়ে ১৭৮৮ সালে ওয়াহাব নিজের শহর ইউইয়ান থেকে বহিস্কৃত হন এবং নজ্দের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নির্বাসিত হন। নির্বাসনকালে সেখানকার সৌদ জাতিকে তার মতে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। নজ্দের প্রধান মুহাম্মদ বিন সৌদের সাথে এমন মৈত্রী হয় যে, সৌদ অধিকৃত অঞ্চলে ওয়াহাবী মত প্রতিষ্ঠা করা হবে। পরবর্তী ১৪০ বছরে সৌদের উত্তরসূরীগণ ১৭৬৩ থেকে ১৮১১ সাল পর্যন্ত আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়ে ইয়েমেন বাদে

সমগ্র আরব ভূ-খন্ড করায়ত্ত্ব করে। সবকচেয়ে বড় সাফল্য আসে অভিযানে বৃটিশদের সহায়তার মাধ্যমে যার ফলে আজকের আধুনিক সৌদি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে অতীতে ব্যবহার করলেও বর্তমান সৌদি সালাফিরা নিজেদের ওয়াহাবী বলে পরিচয় দিতে চায় না। বৃটিশ-ভারতে ওয়াহাবের অনুসারী প্রচার ছিলেন মাওলানা সৈয়দ আবু আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯)।

আরবে ইব্রাহীম পাশা কর্তৃক ওয়াহাবীরা পরাস্ত হবার পর ১৮২০ সালে সৌদ রাজবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে রিয়াদকে শাসনকেন্দ্র করে ওয়াহাবীরা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ৩২ বছর শাসন করবার পর পুনরায় ক্ষমতাচ্যুত হলে ১৯০১ সালে বৃটিশদের সাহায্যে সুলতান আব্দুল আজিজ এবনে সৌদ আরবের ভূখন্ডে বর্তমান সৌদি আরব রাষ্ট্রকে তৈরি করেন।

আহলে সুন্নত জামাত খারেজি, সালাফি ও তার শাখা-প্রশাখা প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করে এবং তারা যে সুন্নত জামাতের কোন কোন মযহবের আড়ালে নিজেদের ভাবদর্শ প্রচার করে বলে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করে। কিছু সুন্নী আলেমদের মধ্যেও এরা প্রভাব বিস্তার করেছে যেমন, হাম্বলী মযহাব অনুসারী মোহাদ্দেস এবনে তায়মিয়া যথেষ্ট প্রভাবশালী। তায়মিয়াকে শায়খুল ইসলাম ইমাম কামালুদ্দীন সোবাকী প্রকাশ্য বাহাসে পরাস্ত করবার পর তার আকিদা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে ফতোয়াসহ রাজাদেশও জারী হয়। সুন্নী আলেমদের মধ্যে তার সমর্থক এখন পর্যন্ত দেখা যায়। সে কারনে সুন্নী মযহবের সঙ্গে ওয়াহাবীদের প্রায়শই পরস্পর প্রবিষ্টভাবে দেখা যায়। জানা যায় যে, হাম্বলী, শাফি ও হানাফি মযহাবের মধ্যে থেকে ওয়াহাবীরা তাদের মত প্রচার করে থাকে। ফলে একদল সালাফি রা-মযহাবী, একদল তায়মিয়ার অনুসারী; আবার তার শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ শাফি ও হানাফি মযহাবের অনুসারী। এই নিয়ে ইসলামী আলেমদের মধ্যে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক দেখা যায়। বেশ কিছু পন্ডিত (আলেম) সুন্নত জামাতের আকিদাকে (বিশ্বাস) খারেজী আকিদার সাথে দৃঢ়ভাবে পৃথক করে দেখান এবং খাজীদের গোমরাহ বা পথভ্রান্ত মনে করেন।

এতক্ষণ ইসলামের যে শরীয়তী ধারাগুলোর আলোচনা করা হল তার বাহ্যিক কঠোরতাকে অপসারণ করে একটা মারফতি অতীন্দ্রীয়তাবাদী ধারা সুফীবাদ বলে মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব রাখে। শিয়া ও সুন্নী উভয় ঐতিহ্যেই সুফীবাদ রয়েছে। এতে হাকিকাহ বা সত্য অন্বেষণের জন্য কেতাবের প্রকাশ্যে প্রতীয়মান অর্থের চেয়ে লুকায়িত অন্তর্গত অর্থের অন্বেষণ করা হয়। এর জন্য অবলম্বন করতে হয় বিভিন্ন পন্থা বা ত্বরীকা, যেমনঃ সাধিলি, কাদেরিয়া, জাহিদিয়া, খালওয়াতি, তিরানিইয়া, নকশবন্দী, চিশতীয়া প্রভৃতি। মোর্শেদ বা গুরু এবং মুরিদ বা শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে এর পরম্পরা। নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে সুফিবাবাদী ধারা

সাব সাহারান আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত ভূ-খন্ডে প্রচলিত হয়েছিল বলে এই সমাজগুলোতে মারেফতি দর্শনের শেকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত রয়েছে।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহে ধর্মরিপেক্ষতা, মযহাব ও ত্বরীকা একই সাথে রিবাজ করে ও পরস্পরের প্রতি চাপ ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও সামরিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় পূর্বের স্বাধীন দেশগুলোতে এবং পশ্চিমের দেশান্তরী মুসলিমদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকটে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিপরীতে এক ধরনের ধর্মকে পুনরায় ধারন করে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন দেখা যাচ্ছে; একে পশ্চিমের পক্ষ থেকে এক কথায় ইসলামবাদী নামে আখ্যা দেয়া হচ্ছে যা আসলে বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের সমন্বয়।

কোরান ও সুন্নাহ সকল মুসলমানের কাছেই সার কথা ও শেষ কথা এবং সকল ব্যাখা বা তাফসীরের মূল বা ভিত্তি। মুসলমানের ঈমান ও আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতার ভিত্তি। মজহাব ও ত্বরীকতসমূহও তার উর্ধ্বে নয়, তার প্রেক্ষিতগত ব্যাখ্যা মাত্র। ব্যাখ্যার ভিন্নতাই এই ঘরানাগুলোকে জন্ম দিয়েছে - কি মানা সঙ্গত আর কি অসঙ্গত তার প্রেক্ষিতগত আইনী মীমাংসা তৈরি করেছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের প্রাচীন আরবী ভাষার বিশেষ সৌকর্যপূর্ন প্রতীক ও রূপকাশ্রিত ছন্দবদ্ধরূপ, তার জাহের ও বাতেন (exoteric and esoteric) উপলব্ধি করতে বিশ্বাসী ভিন্নভাষাভাষী, পন্ডিত কি আম মুসলমানের, তাফসীর বা ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সমস্যাটা ঘটে তখনই যখন এই তফসীর থেকে ক্ষমতা প্রবাহিত ও স্থানান্তরিত হয়, ক্ষমতা প্রাপ্তি ঘটে ও হারিয়ে যায়। কারও পক্ষে গদিনশীনতা স্বীকার করে, কারও বিপক্ষে দাঁড়ায়। এই তাফসীর মুসলিম জনসাধারনের কর্তৃত্বের প্রতি সম্মতিকে প্রতিষ্ঠা করে এবং স্থানচ্যুত ও বরখাস্ত করে। ইসলামের মধ্যকার বিভাজনের এই লৌকিক জায়গাটাকে সেভাবে বুঝতে হবে।

মযহাব ও তরিকতের বিভাজন ঘটেছিল ইসলামের মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাতের ফসল হিসেবে। সেই ইতিহাসে বিরাট ভূমিকা রেখেছে খিলাফত, সালতানাৎ ও রাজবংশের ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তত্বের লড়াই। এই বিভাজন সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তা-ও প্রধানতঃ এই খলিফা, আমিরুল মোমিনীন ও ইমামের রাজনৈতিক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অর্জনের সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ আকারে লিপিবদ্ধ। তাতে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের পুরোপুরি পৃথকীকরণ ঘটেনি; আধ্যাত্মিক নেতাই রাজনৈতিক নেতা। এই বৃহৎ বয়ানে রাজবংশ ও ধর্মীয় নেতৃত্বের পট পরিবর্তনের বিবরনী সমাজের অন্তর্গত রদবদল ও বিকাশের অন্তহীন দ্বন্দ্বের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা জানবার কোন পরিসর রাখে না। সাধারণ মুসলমান

জনগনের সামাজিক জীবন, জীবন সংগ্রাম, ক্ষমতার লড়াইয়ে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিরোধ ও আপোষ, ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে কিভাবে তারা তাদের সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করেছিল সে সম্পর্কে জানবার কৌতুহল ও প্রয়োজন মেটাবার কোন সহজ উপায় নেই।

যেহেতু এই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতার উৎস পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান ও হাদিস, ক্ষমতার লড়াইয়ে এর ভিত্তি হয়ে ওঠে তার তফসীর বা ব্যাখ্যা। এর ব্যখ্যার ওপরই ক্ষমতাকামী কোন পক্ষের ক্ষমতা জায়েজ বা বৈধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইসলামের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লড়াইয়ে, ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠায় তফসীরের ভূমিকা অসীম। তফসীরের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষমতার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে; জায়েজ-বাতিল এর প্রতিষ্ঠা করে; এবং তফসীরকারীদের মধ্যে মতভেদ থেকে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যে বিভাজন সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে এই মতপথের পার্থক্য কেবল ধর্মাচরণের বা আধ্যাত্মিক মুক্তি বা নাজাত অর্জনের তৃরীকার ফারাক হয়ে থাকে না বরং দুনিয়াবী জীবনের বিন্যাসকে জটিলভাবে বিভাজিত করে এবং পরিচালিত করে।

ঘ. প্রত্যক্ষণমূলক অভিজ্ঞতার পার্থক্য

বিভিন্ন সমাজে পৌছে ধর্ম বিশ্বাস যেমন তার সাথে আকৃতি লাভ করে, তেমনি ধর্মভাব একই সমাজের সকল স্তরেও সমরূপভাবে সমার্থক তাৎপর্য নিয়ে বিরাজ করে না। সমাজের মধ্যস্থিত অসমরূপতার সাথে ধর্মভাব অর্থ লাভ করে। তাতে করে এক একটি ধারা বিশেষ শক্তিমত্তা ও প্রাবল্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বিশ্বাসের অসমরূপতাকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে আমরা দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষীণতার ও সংকীর্ণতার পরিচয় দিই। সামাজের আইডিয়াল টাইপ বা আদর্শ ছাঁচ এবং বাস্তবে তার বিচ্যুতি - উভয়ই পর্যবেক্ষণযোগ্য। আবার আদর্শ ছাঁচকে যেভাবে ক্ষমতার দ্বারা তৈরি করা হয়, একই সঙ্গে বিরাজ করা তার প্রতি-আদর্শের প্রতীক নির্মাণও অনুধাবন করা দরকার। এই পর্যবেক্ষণে নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত আনুকুল্য রয়েছে।

একেশ্বরবাদ, পয়গম্বর ও আসমানী কিতাব অবলম্বী ধর্ম বিশ্বাস ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজ স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে বহু চেহারায় ও আকৃতিতে গঠিত হয়েছে এবং কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজ বাস্তবতার পরিসরে বিরাজ করে। ইসলামের সাধারণ ও মৌল বিশ্বাসের এই বিশেষ রূপকে দৃষ্টিভঙ্গী বা পদ্ধতিগত কারণে জ্ঞান চর্চার অতীত হয়ে থাকলে মুসলমান সমাজগুলো সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি তৈরি করার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অথচ এই বহুত্বকে পাওয়া যায় মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের ঐতিহাসিক ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্রত্যক্ষণমূলক গবেষণাগুলো আমাদের সেই পথ দেখায় (গিয়ার্টর্জ: ১৯৬০, ১৯৭৩;

উডওয়ার্ড:)।[২৬] সমাজ ব্যবস্থার অংশ রূপে ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের গঠন প্রক্রিয়া সেই সমাজের সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তঃস্থ থাকে এবং তা সামাজিক ইতিহাসের পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করে।

উৎপত্তিস্থল থেকে বিস্তারকালে অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মতই স্থানিক সংস্কৃতিতে ইসলামের আত্তীকরণ ঘটেছে স্থানিক বৈশিষ্ট্যকে ধারন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাখায় হাজির হয়েছে ধর্মের পথ নির্দেশ। ইসলামকে স্থান-কালের প্রেক্ষিতে অতীতে বা বর্তমানে বহুরূপে পাওয়া যায়। সমাজ-ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামকে বোঝা সম্ভব নয়। সমাজে ইসলামীকরণ কিভাবে ঘটেছে তার ইতিহাস ছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক ইসলামকে কোন সমাজের প্রেক্ষিতেই বোঝা সম্ভব নয়। আরবে যে রূপে ইসলাম ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছিল, হুবহু সেইভাবে কোথাও ইসলামের বিস্তার ঘটেনি। বিভিন্ন অবস্থায় তার রূপ বদল ঘটেছে যাকে রবার্ট রেডফিল্ডের প্রবর্তিত প্রত্যয়ে বলা যায় ক্ষুদ্র ঐতিহ্য (small tradition)। এই ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের নিবিড় ও ঘন পাঠ বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের অনুধাবনকে পরিষ্কার করে তুলবে।

গিয়ার্টজের তার গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখিয়েছেন কিভাবে দুটি সম্পূর্ন ভিন্ন সভ্যতা - পশ্চিম আফ্রিকার মরোক্কো ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায় - ইসলাম দুটি ভিন্ন সামজিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়ে দু'জয়গায় স্বতন্ত্র অর্থ ধারন ও বহন করছে, নিজস্ব ইতিহাসের সাপেক্ষে দু'টি পৃথক আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। মরোক্কোর ধর্মীয় জীবন বলতে বোঝায় কর্মশীলতা, নৈতিকতা ও তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ইন্দোনেশিয়ায় তার জোর নান্দনিকতা, অন্তর্মুখীনতা ও ব্যক্তিসত্ত্বার নিমজ্জনে। এই কৌতুহলজনক পার্থক্য থেকে গিয়ার্টজ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে তার তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন।[২৭]

বাংলায় ইসলামের সম্প্রসারণের প্রকৃতি সম্বন্ধে রিচার্ড ইটনের আকর গ্রন্থটি (ইটন:১৯৮৩) বাঙালী মুসলিম সমাজের বিকাশ বুঝতে পথ নির্দেশনা যোগায়। পূর্বঙ্গীয় আর উত্তর ভারতীয় মুসলিম জীবনাচরনে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। বাংলা ব-দ্বীপের পলল কৃষিভূমি আবাদ করে কৃষক সমাজের জন্য একটি সভ্যতার মিশন রূপে সুফী-দরবেশ, পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে ইসলাম একটি বিশেষ রূপে বিস্তার লাভ করেছিল যেখানে মুসলমান পরিচয়ের অর্থ কোনো বুজর্গ ব্যক্তির মুরীদ হওয়া, কারো বায়েত গ্রহণ করার থেকে পৃথক নয়। সেখানে মুর্শিদের সেই ইতিহাস গৌড়ে বখতিয়ারের ঘোড়া এসে পৌছানোর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাঙালী মুসলমানদের ওপর আউলিয়া-কেরামগণের গভীর প্রভাব ও তাদের সমাজ সংগঠনে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎস সেই ইতিহাসের পাঠেই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই বসনিয়ার মুসলিম,মুরীয় স্পেনীয়,

সুদানী, বাঙালী বা আফ্রো-আমেরিকান, ইন্দানেশীয় বা ভারতীয় মুসলিম হওয়ার অর্থ বিবিধ। এই বিবিধ অর্থসমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনাকে সমেত পাঠ করতে হবে।

ঙ: শেষ কথা

ইসলাম ধর্মীয় ধারাগুলোকে পরিমানে, গুণে ও ব্যাপ্তিতে স্থানিক ও বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে স্থাপন করা প্রয়োজন। উপনিবেশ-উত্তর কালে কেন্দ্র ও প্রান্ত রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা, কর্তৃত্বের আইনী বৈধতা প্রতিষ্ঠা, আইন শাসন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের চলমান বাস্তবতায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে রাষ্ট্র ও সমাজের একটা কাঙ্খিত মূর্ত রূপরেখা নির্মাণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ধর্মীয় রূপক (metaphor) ও ভাষালঙ্করের (rhetoric) প্রয়োগ দুই জায়গা থেকে দু'ভাবে উঠে আসছে এবং আসতে থাকবে। ধর্মীয় রূপক ও ভাষালঙ্কার কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সে জায়গাটিতে বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার। সেজন্য পশ্চিমা আধুনিক রাজনীতির বাধাঁ গঁৎ (stereotype) ও পরিভাষার উর্দ্ধে উঠে আসতে হবে। যে রাজনীতি ও প্রতিষ্ঠান তথাকথিতভাবে আধুনিক নয় আর যে রাজনীতি তথাকথিত ধর্মাশ্রিত ও ঐতিহ্যনির্ভর, সংস্কৃতিগত এ'দুয়ের ফারাক এর ধাঁধাঁর সমাধান সেখানে।

ওয়াজ-মাহফিল-ওরস, ধর্মীয় জলসা ও কিতাবে চলমান বাহাস রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে আকৃতি দান করে আবার সেখান থেকে নিজেও আকৃতি লাভ করে। সহী ও বাতেল ফেরকার লড়াইয়ের এই বিভাজনগুলোর সুদীর্ঘ ও পরস্পর-প্রবাহিত ইতিহাস রয়েছে যা বর্তমানের ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপট রচনা করে। এই বিতর্কগুলো বৈধতার বিতর্ক - ক্ষমতার দাবী ও তার অস্বীকৃতির বিতর্ক, যাকে উপেক্ষা করে ইসলাম ধর্ম বা মুসলমান সমাজের গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অথচ এই বিতর্কগুলো সামাজিক জীবনকে কিভাবে কোনদিকে প্রবাহিত করেছিল এবং সামাজিক সম্পর্কের বুনটকে কিভাবে রচনা করেছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য দলিল প্রস্তুত অবস্থায় নেই। যেভাবে যতটুকু সুলভ আছে তা বৃহৎ বয়ান আকারেই দৃশ্যমান।

ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলো (ফেতনা-ফ্যাসাদ) তার বাইরের সংঘাতের গঠনকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়, দেবার কথা। সেখান থেকেই পশ্চিমের সাথে মোলাকাৎকে দেখতে হবে, যদি আমরা এই দিক থেকে দেখতে চাই। পশ্চিমের জ্ঞানতত্ত্বে কিভাবে ইসলামের মূর্তি খাড়া করা হয়েছে, তার সাথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক যতখানি আজকের জন্য জরুরী প্রশ্ন, ততখানিই জরুরী জানা যে, এই মোলাকাৎ ব্যতিরেকেও সংঘাত সমূহের একটা স্থানিক ও বৈশ্বিক বিকাশ ছিল ও রয়েছে। নিজেদের সংঘাতগুলোকে নিজেরা কিভাবে মোকবেলা করেছিল, নিজেদের সমাজের

অভ্যন্তরে শ্রেনী-লিঙ্গ-বর্ণ-বংশ-মর্যাদাগত বৈষম্য ও নিপীড়নকে কিভাবে বিদ্ধ করেছিল, পরস্পরের হক আদায় করেছিল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিল অথবা পীড়ন ও বঞ্চনা করেছিল ও তার পক্ষে শাসকের জন্য সম্মতি আদায় করেছিল- তার গভীরতর অনুসন্ধান হওয়া চাই।[২৮]

টীকা

[১] স্যামুয়েল হান্টিংটন (হান্টিংটন: ১৯৯৬) ও তার অনুসারীবৃন্দ।

[২] উদাহরণস্বরূপ: মাকিন দখলকৃত ইরাকের পরিস্থিতিতে কুর্দি- শিয়া-সুন্নীদের বিরোধ ইরাকীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে যে চেহারা দিচ্ছে; অথবা, ইরাক-ইরান যুদ্ধে শিয়া-সুন্নী বিভেদের ভূমিকা; পাকিস্তানে শিয়া উপসনালয়ে কিংবা বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের শাখা আহমেদিয়দের উপর হামলা প্রভৃতি।

[৩] মুসলমান প্রধান দেশের বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিশ্চানেরও নয়, বিভিন্ন দেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদেরও নয়।

[৪] দৃষ্টান্তস্বরূপঃ- খ্রীশ্চানদের মধ্যে প্রধান ধারাগুলো হলঃ রোমান ক্যাথলিক, অর্থডক্স,প্রটেস্ট্যান্ট, এঙ্গলিকান। বিভিন্ন বিচারে আরও ধারাগুলোর মধ্যে রয়েছে, কনজারভেটিভ, মেইন লাইন, লিবারেল, অ্যামিশ থেকে দ্য ওয়ে, ক্যালভিনিজম, আরমেনিয়ানিজম,ব্যাপটিজম, লুথেরান, পেন্টোকোস্টাল, কোয়েকার, ইভানজেলিক্যাল প্রভৃতি। সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ দলটি হল, প্রটেস্ট্যান্ট। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধারাগুলো হল: হীনযান, মহাযান,বজ্রযান। এছাড়াও রয়েছে, পূর্ব এশিয়ার জেনবাদ, পিওরল্যান্ড,, নিচিরেন প্রভৃতি। এরকমভাবে অন্যান্য ধর্মেরও বহু ধারা বিভাজনের উদাহরন দেয়া যায়।

[৫] আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে রাষ্ট্রীয় আদর্শ রূপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর এক-কেন্দ্রিক নতুন বিশ্বব্যবস্থায়।

[৬] এই প্রসঙ্গটি এখানে বিস্তৃত করা হবে না।

[৭] মরিস ব্লখ (ব্লখ:১৯৮৫) ও ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ প্রণিধানযোগ্য (গিয়ার্টজ:১৯৭১,১৯৭৩)| Bloch, Maurice (1985)- *From Blessing to Violence: History and Ideology in Circumscision Ritual of the Merina of Madagascar*, Cambridge University Press, Cambridge. তাছাড়াও ভাবরতীয় জাতিবর্ণব্যবস্থা (caste) নিয়ে প্রত্যক্ষণমূলক মাঠ গবেষনাও এতে আলোক সম্পাত করতে পারে, যা থেকে ধ্রুপদী বৈদিক চতুর্বণশ্রম প্রথার সর্বভারতীয় পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে স্থানিক জাতিবর্নের গঠন, এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: শ্রী নিবাস, লুই দ্যুঁমো, ডেভিড পোকক, লীলা ডুবে প্রমুখের গবেষনা।

[৮] বিশেষ করে সর্বপ্রাণবাদী সনাতনী ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে।

[৯] ১৯৩০সালে একে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন আরেক প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স। অধ্যাপক ডঃ জহির আহমেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত এন্থনি গিডেন্স এর ভূমিকা সম্বলিত কপিটি আমি পাই।

[১০] ধ্রুপদী অর্থনীতির নীতিমালাও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার পূর্বনুমান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লাভবান হবার লক্ষ্যে পরিচালিত এই যুক্তিশীল আচরণ এবং যার দ্বারা বাজারের ভারসাম্য তৈরি হয়।

[১১] দেখুন, Tawney, Richard (1926) - *Rreligion and the Rise of Capitalism.*

[১২] ১৯০৪ সালে প্রটেস্টান্ট এথিকস্ প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৫ সাথে গ্রন্থাকারে।

[১৩] দেখুন, http://www.stnews.org/News-362.htm

[14] অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে এর একটি বাংলা অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

[১৫] গ্রন্থটির অধ্যায়ের নামকরণগুলো এই রকম: The Religious Spirit of Islam, The Political Spirit of Islam, The Political Division and Schimism in Islam, The Literarary and Scientific Spirit of Islam, The Rationalistic and Philosophical Spirit of Islam ইত্যাদি।

[১৬] স্পেন থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত শাসনের ও সাম্রাজ্য স্থাপনের যে অভিজ্ঞতা মুসলমানদের রয়েছে তা প্রাক-আধুনিক যুগের যখন বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলেও সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার পুজিঁবাদী রূপান্তর ঘটে উঠেনি।

[১৭] ডঃ মোস্তফা আল- এব্বাদি ও ডঃ মোহামেদ মাহমুদ আল গোহারী প্রমুখ। Dr. Mostafa El-Abbadi -A Historical Approach to the Understanding of Progress within Islamic Culture Ges Dr. Mohamed Mahmoud El Gohary – Max Weber and The Development of Capitalism in http://www.goethe.de/cgi-bin/goethe-print/print-url.pl?url=http://www.goethe.de/ins/vb/prj/fort/2004/alx/ref/enindex pr.htm

[১৮] যেহেতু মানবজাতির ইতিহাস হল তার শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস।

[১৯] বাংলাদেশে এর দৃষ্টান্তস্বরূপঃ লা-মযহাবী আহলে হাদিস এর ইনসাফ পার্টি, ওয়াহাবী ও মওদুদীদের জামায়াতে ইসলামী, দেওবন্দী কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামী ঐক্যজোট, সুফীবাদীদের তরিকত ফেডারেশন প্রভৃতি।

[২০] ইসলামী ধারাগুলোর ইতিহাস ও বিশ্বাস অনুধাবনে তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছে: কর্ধভসধহহ: ১৯৭৬, চিশতী:১৯৮৩ এবং তথ্যপঞ্জীতে উল্লেখিত ওয়েবসাইটসমূহ। এ বিষয়ে উপলব্ধি তৈরিতে আমার পিতা মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম চিশতীর ধ্যান-ধারনা ও ধর্মালোচনা আমাকে প্রথম সাহায্য দিয়েছে।

[২১] এই অংশটিতে প্রাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশন ঘটানো হয়েছে মাত্র, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর অবকাশ লেখকের ঘটেনি। এ নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসের সংগ্রহ রয়েছে, যা এখানে ব্যবহার করা হল না। ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে খলিফা, আহলে বায়েতের নামের প্রথমে হযরত ও শেষে 'রহঃ' পড়তে হবে।

[২২] লা ইলাহা ইল্লালহ মালেকে ঈয়ামুদ্দীন'

[২৩] ক্রসেড বা কা ধর্মযুদ্ধের যুগ হল একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী (১০৯৫-১২৯১)। এসময়ে নয়টি ক্রসেড বা ধর্ম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

[২৪] ১২০৩ হিজরীতে তুরস্কের খলিফা সুলতান আব্দুল মজিদ খানের পর সুলতান তৃতীয় সেলিম সিংহাসনে আরোহন করেন।

[২৫] সম্প্রতি ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায়ঃ Kitab-at- Tawheed, The Book of Tawheed- Shaik Imam Muhammad Abdul Wahab, and Translation: Sameh Strauch, International Islamic Publishing House, Riyad, Saudi Arabia, 1998.

[২৬] গিয়ার্টজ ও উডওয়ার্ড এর জাভার মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণা অগ্রণী দৃষ্টান্ত। Woodward, M. R. (1988)- *The Selamatan: textual knowledge and ritual performance in Central Javanese Islam*. History of Religions

[২৭] Geertz, Clifford - *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago University Press, 1971

[২৮] সম্পাদক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবন্ধ পর্যালোককে লেখাটির খসড়ার ওপর বিস্তৃতভাবে নিষ্ঠ সমালোচনা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খসড়া অবস্থা থেকে প্রবন্ধটিকে সবিস্তারে পুনঃমার্জনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

চিশতী, মাওলানা ছৈয়দ গোলাম মাওলা (১৯৮৩)- *অহাবী ইতিহাস*, খানকায়ে চিশতীয়া,পন্ডিতসর, ফরিদপুর।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (১৯৯৬) - *বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আচার্য, অনিল (সম্পা. ১৪০৮ বাং)- 'অনুষ্টুপ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র ও ঐসলামিক মৌলবাদ' এ আবদুর রাউফ- *ইসলামকি মৌলবাদ ও ইজতিহাদ*, হাসান উইসেফি এক্কেভারি-*ইসলামে মৌলবাদ ও আধুনিকতাবাদ*, হাসান আল তুরাবি- *আধুনিক মৌলবাদের দর্শন ও রাজনীতি*, আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার- ভারতীয় ইসলাম ও স্বাধীনতোত্তর সংস্কার আন্দোলন।

এডওয়ার্ড সাঈদ (২০০৬)- *কাভারিং ইসলাম*, অনু: ফয়েজ আলম,সংবেদ, ঢাকা।

খান, বেনজীন (২০০৫)- *এডওয়ার্ড সাঈদ, আবিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর* , সংবেদ, ঢাকা।

Ahmed, Akbar S. (1992)- *Postmodernism and Islam, Predicament and promise,* Routledge,Londona and New York.

Ahmed, Akbar S. (1993) – *Islam Today, A Short Introduction to the Muslim World*, I.B. Tauris Publishers, London.

Ali, Syed Ameer (1922)- *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet*. Publisher: Christophers. Place of Publication: London; (reprint: 1978) London: Chatto & Windus.

Asad, Talal (1993) – *Genealogies of Religion, Displine and Reasons of Power in Christianity and Islam*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London.

Bassiouni, M. Cherif (1988)- Schools of thought in Islam,Chicago,September in *http://www.mideasti.org/indepth/islam/schools.htm*

Eaton, Richard (1993)– Rise of Islam in the Bengal Frontier, 12-4-176-, University of California Press, Berkley.

Engineer, Asghar Ali (2006) – *Multiple Understandings of the Qur'an*, Free Muslim Coalition Against Terrorism in *http://www.freemuslims.org/document.php?id=42*

Feuchtwang, Stephan (1975)– *Investigating Religion* in Maurice Bloch- Marxist Analysis and Social Anthrpology, ASA Studies,Tavistock Publication, London Geertz, Cliford (1973)- *The Interpretation of Cultures,*Fontana Press,London.

Geertz, Clifford (1973)- *The Interpretation of Cultures*, Fontana Press '93, London.

Gilchrist,John- *Muhammad and Islam* in http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Vol1/index.html

Hantington, Samuel P. (1996) - Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,Penguin Books,Delhi.

Husain, Syed Anwar (2004) -*Max Weber's Sociology of Islam, A Critique*, – *Bangladesh E-journal, Vol.1 No. 1, January 2004 in* http://www.bangladeshsociology.org/Max%20Weber-Anwar%20Hosain.htm

Kaufmann, Walter (1976) – *Religions in Four Dimensions, Existential, Aesthetic, Historical, Comparative*, Reader Digest Press, New York.

Said, Edward (1978)- Orientalism, Penguin Books, London.

Said, Edward (2001)- *There are many Islams* in http://www.lacan.com/said.htm

Siddiqi, Muzammil H. (2005) in *How and why the different schools of Islamic law emerged in* http://www.islamfortoday.com/madhab.htm

Weber, Max (1930)- *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*,George Allen & Unwin Ltd., London..

Zeid, Abou (2004) -*Protestantism, Capitalism and Islam, Critique of Weber's Thesis*, Goethe Institute, in http://www.goethe.de/ins/vb/prj/fort/2004/alx/ref/abs/en94470.htm#top

ওয়েবসাইট:

http://en.wikipedia.org

http://about.com/

http://atheism.about.com/library/glossary/islam/bldef_faraj.htm

http://Edward Said, Impossible Histories Why the Many Islams Cannot be Simplified, Harper's, July 2002.htm

http://Denominations and Sects of Islam - ReligionFacts.htm

http://Science & Theology News - Weber's 'Work Ethic' heralded at Cornell.htm

http://www.metareligion.com/Extremism/Islamic_extremism/wahhabism.htm

http://www.mideasti.org/indepth/islam/schools.htm